কুম্ভমেলা ও অমৃত প্রসঙ্গে

অধ্যাপক তিলক ভট্টাচার্য্য

২৫শে জানুয়ারি, ২০২৫

কুম্ভমেলা সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমে জানতে হবে ''কুম্ভ''র অর্থ কি? ''কুম্ভ''র অর্থ হল কলসি। অমৃত কুম্ভ হল একটি বিশেষ কলসি যার মধ্যে অমৃত থাকে। কুম্ভমেলা পালিত হয় প্রয়াগরাজ এর ত্রিবেণী (তিন নদীর মিলন ক্ষেত্র) সঙ্গমে। যেখানে, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী – এই তিন নদী এসে মিলিত হয়েছে, সেই ত্রিবেণী সঙ্গম স্থলে এই মেলা উদযাপিত হয়। বর্তমানে, ২০২৫ সালের কুম্ভ-মেলাতে, খবরের কাগজের হিসেব অনুযায়ী প্রায় 60 কোটি মানুষ পুণ্য-স্নান করেছেন। প্রয়াগরাজে এই সময়, সরকারের পক্ষ থেকে আলাদা করে কুম্ভ নগরী তৈরি করা হয়, যেখানে সনাতন সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়া তৈরী করা হয়, ভক্তদের অস্থায়ী বাসস্থান তৈরি করা হয়, যাতে পুণ্য-স্নান চলাকালীন ওঁরা সেখানে ভাল করে থাকতে পারেন। এই আখড়া হল এক একটি institution-এর মতো। প্রতিটি আখড়ায় একজন পীঠাধীশ (Head) থাকেন যাকে আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর বলা হয়। এঁরা প্রথমে তাঁদের সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে স্নানে যান, তারপর সাধারণ মানুষ স্নানের সুযোগ পান।

যে কোনও event মানেই আয়-ব্যয় দুই বোঝায়। এর অর্থ হল, যখন আমরা কিছু ব্যয় করছি, তার মানে অন্য কারুর তাতে আয় হচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতির সঞ্চলন (circulation) হয়। অর্থাৎ কুম্ভমেলার একটি অর্থনৈতিক দিক অবশ্যই আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ কেন যায়? আসব সেই প্রসঙ্গেই।

যে কোনও একটা কাজ করলে, তার পিছনে কোনও উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ। নয়তো কাজটি অর্থহীন হয়ে যায়। ঠিক তেমনই অনেকে মনে করেন কুম্ভস্নান একটি পবিত্র স্নান। এবার প্রশ্ন হল, কেন? এই পবিত্র স্নানের যথাযথ উদ্দেশ্য কি? কাল্‌কূটের লেখা ''অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'' গ্রন্থটিতে উনি সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন যে কুম্ভে মানুষ কেন যায়? অমৃত কুম্ভের একটা পৌরাণিক পটভূমিকা আছে। এই পটভূমি থেকে আমাদের বাস্তবে যেতে হবে। পুরাণ শাস্ত্র যেমন রামায়ণ, মহাভারত, হরি-বংস, বিষ্ণুপুরাণ – সকল গ্রন্থেই কুম্ভের উল্লেখ রয়েছে। কুম্ভ অর্থাৎ সমুদ্র-মন্থন। এই সমুদ্র-মন্থন নানারকম ভাবে ঋষিগণ বর্ণন করেছেন। তার মধ্যে আমাদের জীবনের শিক্ষা প্রচুর রয়েছে। পুরাণে কথিত আছে দেবরাজ ইন্দ্র যেহেতু স্বর্গাধিপতি ছিলেন, সেই কারণে তাঁর মধ্যে সামান্য অহংকার ছিল, যা অপ্রকাশিত ছিল। একদিন ঐরাবতে চড়ে দেবরাজ ইন্দ্র কোথাও যাচ্ছেন, এমন সময়ে পথে দুর্বাসা মুনির সাথে দেখা হল তাঁর। দুর্বাসা মুনি ছিলেন রাগী ঋষি। যাই হোক, দুর্বাসা মুনিকে তিনি প্রণাম করলেন। দুর্বাসা মুনি সন্তুষ্ট হয়ে নিজের গলার পারিজাত পুষ্পের মালা দেবরাজ ইন্দ্রের গলায় পরিয়ে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু ইন্দ্র অহংকার বশত সেই মালাকে তাঁর ঐরাবতের দাঁতের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। মদমত্ততায় কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হলে মানুষের যে দশা হয়, হাতি তার প্রতীক। সেই কারণে জগদ্ধাত্রী পূজায় দেখা যায়, সিংহের তলায় হস্তী রয়েছে। অর্থাৎ

করীন্দ্রাসুর অর্থাৎ হস্তীরূপী আসুরিক শক্তিকে দমন করে মা বিরাজ করছেন – অর্থাৎ মানুষের মনের মত্ততাকে বিনাশ না করলে জগদ্ধাত্রীর কৃপা হয় না। এবার গল্পে ফিরে আশা যাক। ঐরাবত উন্মাদ হয়ে পারিজাত পুষ্পমালা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। এরপর ঋষি দুর্বাসা ঐ পথেই ফিরবার সময়ে দেখেন যে তাঁর পুষ্পমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পরে আছে। দুর্বাসা মুনি ছিলেন ক্রোধী ঋষি। তিনি ক্রোধবশে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, যে দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মীচ্যুত হবেন। এই পৌরাণিক গল্প থেকে কি শিক্ষা আমরা পাই? যে, যাকে-তাকে সব দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ নয়। এর মানে এই নয় যে সেই লোকটি খারাপ, কিন্তু সে কতটা দায়িত্ব নিয়ে কাজটি করতে পারবে তার সংশয় আছে।

লক্ষ্মী অর্থ শ্রী। যতকিছু সৌন্দর্য্য সবই শ্রী-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই শ্রী বা লক্ষ্মীকে দেবরাজ ইন্দ্র হারিয়ে ফেললেন। একটি জ্যোতির্ময় গোলককে স্বর্গ থেকে বেড়িয়ে যেতে দেখে ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কে? জ্যোতির্ময়ী জানালেন যে, ''আমি তোমার স্বর্গলক্ষ্মী, আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম। তোমার কিছু গুণের জন্য আমি এখানে ছিলাম। কিন্তু এখন তুমি অভিশাপের ফলে সেই গুণের অধিকার হারিয়েছ, তাই আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম''। এই বলে তিনি স্বর্গ পরিত্যাগ করলেন। এর ফলে স্বর্গ শ্রী চ্যুত হল। ইন্দ্র তখন দেবগুরু বৃহস্পতির স্মরণাপন্ন হলেন। তিনি ইন্দ্রকে নিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গেলেন এই বিষয়ে পরামর্শ করতে। ব্রহ্মা বললেন যে লক্ষ্মীদেবী কে স্বর্গে ফিরিয়ে আনতে হলে সমুদ্র মন্থন করতে হবে। কিন্তু এর জন্যে অসুরদের সাহায্য নিতে হবে। কারণ দেবতারা একা সমুদ্র মন্থনে অনুপযোগী। যে কোনও মহৎ কাজ করতে গেলে সকলকে নিয়ে করতে হয়। সেজন্য ব্রহ্মা উপদেশ দিলেন যে এখন স্বর্গের শ্রী ফিরিয়ে আনতে গেলে দেবতা অসুর সকলকেই মিলিত হয়ে কাজ করতে হবে। বর্তমান রাজনীতিতেও লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, পার্লামেন্টে স্টেট দখলের উদ্দেশ্যে, ভিন্নমতাবলম্বী দলগুলো একজোট হয়। উদ্দেশ্য সফল হলে আবার তারা আলাদা হয়ে যায়, কারণ সেখানে আর কোনও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে না। একইভাবে, ইন্দ্র অসুরদের বোঝালেন যে সমুদ্র মন্থন করলে, অমৃত পাওয়া যাবে। এই অমৃতের অনেক গুণ। তাই অমৃত পেলে তারা সবাই সেটা ভাগ করে নেবেন। অথচ লক্ষ্মী দেবীর কথাটি গোপন রাখলেন। অসুররা এই কথায় রাজি হলেন। এই রাজনীতির খেলা আজকের নয়। হাজার হাজার বছর আগের থেকে। আমাদের শাস্ত্র মনস্তত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি নিয়ে তৈরী। আমাদের শাস্ত্র পড়লে বোঝা যায় যে শাস্ত্রকাররা কত বিচক্ষণ ছিলেন। যাইহোক, অসুরদের বোঝানো হল যে, সমুদ্র মন্থন করলে অমৃত উঠবে, যা খেলে অনেক লাভ হবে। এইবার দুইয়ে মিলে সমুদ্র মন্থন করা শুরু করলেন। সমুদ্রকে রত্নাকর (রত্নের আকর) বলা হয়। অনেক দিন ও কাল ধরে মন্থন করতে করতে অনেক কিছুই উঠতে লাগল। ত্রয়োদশীতে ধন্বন্তরী উঠলেন একটি কলসি নিয়ে। ইনি হলেন ভগবান শ্রীহরির অবতার এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের ও আয়ুর্বেদের জনক। ওনার ছাত্র ছিলেন চরক। চরকের ছাত্র ছিলেন সুশ্রুত। পরে সুশ্রুতের মাধ্যমেই আয়ুর্বেদ বিদ্যা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দেবতারা মনে করতেন এই কলসির মধ্যে যে পানীয় ছিল, তাই অমৃত অর্থাৎ একপ্রকারের ঔষধ যা সর্বপ্রকার রোগ নিরাময় করবে এবং আয়ু, বল, শ্রী সবই বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্র মন্থনে একসময় বিষও উঠেছিল। অর্থাৎ যখনই কোনও ভাল কাজ করা হয়, তার মধ্যে খারাপের একটি প্রভাব (effect) থাকবেই। যেমন রাজা রামমোহন রায়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে উদ্যত হওয়ায়। অপরদিকে ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের শত্রুর কোনও অভাব ছিল না। এগুলিই বিষ। ভাল কাজ করলেই এতে বিষের প্রভাব থাকবেই। আর যারা ভাল কাজ করেছেন তাঁরা পৃথিবীতে বেশিদিন থাকেননি। যেমন আচার্য শঙ্কর বত্রিশ, বিবেকানন্দ ঊনচল্লিশ, প্রণবানন্দ পঁয়তাল্লিশ, শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চাশ বছর মাত্র বেঁচেছিলেন। এছাড়াও সিস্টার নিবেদিতা, সক্রেটিস, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু – এঁরা সকলেই স্বল্পায়ু ছিলেন। কারণ এনারা সমাজ কল্যাণের জন্য নিজেদের শরীরের কথা ভাবেননি কখনও। একটা সময়ে সত্য বলার জন্যে সক্রেটিসকে বিষ খেতে বাধ্য করা হয়েছে। এঁদের আত্মত্যাগ এর গুণেই এনারা মহান এবং গুরুস্থানীয়। এঁদের থেকে এটাই শেখার। এবার ফিরে যাই সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গে। সমুদ্র মন্থনে বিষ উঠতে লাগলো। এই বিষ পান করলেন শিব। জগতকে পালন করার জন্য, ভগবানের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য যিনি আত্মত্যাগ করেন, তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। মহাদেব কে সেই কারণে বলা হয়,

''...বৈষ্ণবাণাং যথা শম্ভুঃ...''

অর্থ - ''বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শম্ভু''

এরপর এই কলসি নিয়ে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল দেবতা ও অসুরদের মধ্যে। একসময়ে সুযোগ বুঝে ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত এই কলসি নিয়ে পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে যাওয়ার সময়ে, জয়ন্ত মাঝে মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পরেন এবং কথিত আছে যে তিনি বারো বার কলসিটিকে বারো জায়গায় রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। আট বার অন্তরিক্ষে, ও চার বার এই ধরণীতে। এই চার জায়গা হল, গঙ্গা তীর, গোদাবরী তট (নাসিক), ত্রিবেণী (প্রয়াগরাজ), মহাকাল ক্ষেত্র (উজ্জয়িনী)। এখানে কলসিটি রাখার সময়ে কলসি থেকে স্বল্প অমৃত চলকে পড়ে যায়। এরপর এই স্থানগুলি কুম্ভ স্থল নামে বিখ্যাত হয়। এই স্থানগুলিতে ১২ বছর অন্তর এই মেলা আয়োজিত হয়। ১২ বছর অর্থাৎ আমাদের বারো বছর মানে দেবতাদের একদিন। তাই বারো বছর অন্তর এই মেলা আয়োজিত হয়। এবং প্রাকৃতিক ভাবে দেখা যায় যে যেই বছর পূর্ণ কুম্ভ মেলা হয়, সেই বছর যদি বৃহস্পতি, চন্দ্র ও সূর্য্য একই সরল রেখায় থাকে, তাহলে সেই কুম্ভকে মহাকুম্ভ বলা হচ্ছে। সবই ঠিক আছে, তাও প্রশ্ন থেকে যায় যে এই অমৃত আসলে কি?

এই অমৃত আসলে কি? এই জন্যেই কালকূট বইটির নাম রেখেছিলেন, ''অমৃত কুম্ভের সন্ধানে''। অমৃতের সঠিক সংজ্ঞা প্রত্যক্ষ ভাবে কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। ধারাযাক, একটি ফর্মুলা তে 'X' এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। মন্থন অর্থাৎ solve করতে করতে 'X' - এর মান পাওয়া গেল – অর্থাৎ 'এক্স' কি তা জানা গেল। একইভাবে অমৃতের সন্ধান করতে করতে আপনাকে নিজেকে জেনে নিতে হবে যে ''অমৃত'' কি। মহাপ্রভু কুম্ভে গেছেন কিনা এরকম তথ্য আমি কোথাও পাইনি। শ্রী রামকৃষ্ণদেব কখনও পুরী যাননি। তিনি কুম্ভ মেলায় গেছেন কিনা তারও কোনও record বা তথ্য পাওয়া যায় নি। ঋক্ বেদ এর মধ্যে সোমরস পান করার কথা বলা আছে। এই সৌরস পান করলে শক্তি বৃদ্ধি হত। এই সৌরস এর গুণকে অমৃত সমান মনে করা হত। এগুলো সবই সমুদ্র থেকে উঠেছে। আবার রামায়ণে দেখা যাচ্ছে যে লক্ষ্মণকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হনুমান মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার মহৌষধি আনার উদ্দেশ্যে হিমালয়ে গেলেন। এই মহৌষধির গাছগুলি থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হত। কিন্তু হনুমান যখন যান সেখানে, বৃক্ষগুলিকে চিনতে পারলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে গোটা গন্ধমাদন পর্বত মাথায় করে তুলে আনেন। কিন্তু আমাদের সোমরস, লতাগুল্ম জলে হয়। হনুমান জলে যাচ্ছেন না, বরং

হিমালয় যাচ্ছেন। তাহলে এই জায়গায় reconciliation (পুনর্মিলন) দরকার। কিরকম? বিজ্ঞান বলছে হিমালয় একসময় সমুদ্র ছিল। এবার যখন জল সরে যায়, সেখানে পর্বত উঠে এল, তখন তার গায়ে গাছ জন্মাল। এই বৃক্ষগুলি থেকে রাতে আলোক বিচ্ছুরিত হত। পুনর্মিলন হয়ে গেল – অর্থাৎ বৃক্ষগুলি জলেই হত, কিন্তু জল সরে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে জন্মাল। অথর্ববেদ-এ ক্যান্সার সারানোর কথা পর্যন্ত লেখা আছে কিন্তু কোন উদ্ভিদ দিয়ে – তা আমরা আজও জানতে পারিনি। স্বয়ং হনুমান জী পারেননি আর আমরা তো সাধারণ মানুষ। তাহলে আমাদের কাছে অমৃত কোনটি?

''প্রপন্না পারিজাতায় তোত্রবৈত্রিকাপনায়
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃত দুহে নমঃ''

ব্যাসদেব যখন ভাগবত রচনা করলেন তখন লিখলেন, ''পিবতঃ ভাগবতামৃতম মুহুরমুহু'' – অর্থাৎ যতক্ষণ পারবে এই ভাগবত তুমি পান কর। যাদের মধ্যে সেই রসবোধ আছে, তারাই এই ভাগবতামৃত পানের উপযুক্ত। একদিকে যেমন সংসারীদের জন্য গীতামৃত, অন্যদিকে বৈরাগ্য যার প্রবল হয়েছে, তার জন্য ভাগবতামৃত।

''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।''

গোপিনিরা প্রভুকে বলছেন, ''তোমার কথা অমৃত স্বরূপ। আমাদের জীবন সর্বদা উত্তপ্ত। এর থেকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র তোমার কথা''। কাশীরাম দাস লিখেছেন,

''মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।''

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন লীলাপুরুষোত্তম, তেমনই গৌরসুন্দর হলেন প্রেমপুরুষোত্তম। তিনি সমাজের কল্যাণের জন্য প্রেম বিতরণ করছেন। তাই তাঁর কথা যদি জানতে পার – ''চৈতন্য চরিত অমৃত''; অর্থাৎ ''চৈতন্যচরিতামৃত'' – কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখা। আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলছেন, শ্রীম লিখছেন – ''শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত''। অর্থাৎ এনাদের সকলের বাণী (কথা) আমাদের সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে, তাই এগুলি কথামৃত। তোমাকে কিছুই করতে হবে না, কোথাও যেতে হবে না, শুধুমাত্র আমার কথা শ্রবণ কর, মনন কর, পালন কর, তাহলেই হবে।

ওঁ অসতো মা সদ্-গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্-মা অমৃতং গময়।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।''

অর্থ (সংক্ষেপে) ঃ

''হে প্রভু, আমাদের অসত্য থেকে সত্যের পথে নিয়ে চল।
অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল।
মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চল।
ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।''